ধরণির
পথে প্রান্তে

জিয়াউল হক

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

হোয়াট অ্যা গ্রেট ড্যাড হি ওয়াজ	১১
স্মৃতির জাম্বিল; পথিকের সম্বল	২২
হোয়াট ইজ ডেথ	৩০
মেরি মেকাফ্রি	৪৩
জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি	৫৪
উম্মু আলার আত্মসম্মানবোধ	৭১
জীবনের গল্প, শুনে যাও অল্প	৮৪
হায়! সাগরের সব জলটুকু যদি কালি হতো	৯৬
নারীবাদী মন : নো ম্যানস ল্যান্ড	১০৯
মুখে যার মধু; জেনো, তার লেজেই থাকে হুল	১২০

হোয়াট অ্যা গ্রেট ড্যাড হি ওয়াজ

ওহ ম্যাগি! শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া গেল! কদিন ধরেই চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। বারবার ভয়েস ম্যাসেজও পাঠাচ্ছিলাম; বিশেষ করে গতকাল থেকে বারবার ফোন করছি, কিন্তু অপর প্রান্ত নিরুত্তর। নিরুপায়, তাই ভয়েস ম্যাসেজটা আবারও দিয়ে রেখেছিলাম—'যত দ্রুত সম্ভব আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।' তবুও কোনো সাড়া নেই দেখে আজও সকাল থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি। অবশেষে কানে বাজল সেই প্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর!

মিসেস মার্গারেট স্কট। ম্যাগি নামেই তিনি পরিচিত; অন্তত আমাদের কাছে। না আমরা তাকে দেখেছি, আর না তিনি আমাদের দেখেছেন। একবার ফোনে কথা হয়েছিল—সে-ও প্রায় বছর চারেক আগেকার কথা। সেটিও ছিল মূলত এক ঠেকায় পড়ে। প্রফেশনের কারণে। কথা বলতে হয়েছিল তার বাবা জোসেফ ক্লার্কের ব্যাপারে।

জোসেফ ক্লার্ক। উনআশি বছরের বৃদ্ধ। বেশ মজার মানুষ। তাকে আমরা সংক্ষেপে 'জো' বলেই ডাকি। আলজাইমারস আর ডিমেনশিয়া, সেইসঙ্গে সিওপিডি (ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজ ওর্ডার) আর আংশিক অন্ধত্ব— এই সব দুরারোগ্য শারীরিক ও মানসিক রোগের উপসর্গগুলো তাকে পুরোপুরি অচল করে ছেড়েছে।

শারীরিক পঙ্গুত্বের পাশাপাশি মানসিক পঙ্গুত্বও পেয়ে বসেছে তাকে। দুই-দুইবার পড়ে গিয়ে হিপ ফ্র্যাকচার করেছেন এবং তার হিপ সার্জারিও হয়েছে।

এখন তো আর হাঁটতেই পারেন না! বিগত তিনটি বছর যাবৎ হুইলচেয়ারই তার একমাত্র অবলম্বন; তাতে বসেই চলাফেরা করেন। তাও নিজে নিজে পারেন না; একজন কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট তাকে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। যখন-যেখানে প্রয়োজন, তারাই তাকে পানাহারসহ দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কাজ করান।

ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রষ্টতায় যারা ভোগেন, তারা কখনো কখনো রোগের ব্যাপকতা অনুযায়ী মেন্টাল লুসিডিটি পেয়ে থাকেন (দিনের কোনো কোনো সময় তারা তাদের স্মৃতিতে ভর করে প্রায় সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতোই অনেক কিছুই মনে করতে পারেন। পরক্ষণেই আবার তা হারিয়ে ফেলেন)।

ইমিডিয়েট মেমোরির চেয়ে তার রিমোট মেমোরিটাই বেশি অক্ষত ছিল। এ রকম 'লুসিড টাইম' জো মাঝেমধ্যেই পেতেন। তখন বহু বছর আগেকার শৈশবের, যৌবনের কথা মনে করতে পারতেন। কখনো কখনো অ্যানির কথাও।

স্ত্রী অ্যানি! কোথায় সে? ভালোবাসা, বিয়ে, আগে-পরে কত স্মৃতি! জো কাজ করতেন এক জাহাজ তৈরির কারখানায়। বিখ্যাত সাউথ শিল্ডে সেটি অবস্থিত। আমাদের এখান থেকে কয়েক কিলোমিটারের পথ; সাত-আট হবে হয়তো। 'টাইন' নদীর ওপারে। এর তলদেশ দিয়ে তৈরি সুড়ঙ্গ পথে সাউথ শিল্ডে যাওয়ার সংখ্যাটা নেহাত কম নয়।

ওখানকার একটা 'পাব' (পানশালা) মালিকের কন্যা ছিলেন অ্যানি। মাঝেমধ্যে সন্ধার পরে দুই-এক পেগ পান করার জন্য সেই পানশালায় যাওয়া পড়ত জো'র। দেখা হয়ে যেত মোহনীয় রূপের অ্যানির সাথে। কি কথায় কি হাসিতে আর সৌন্দর্যে, সবখানেই মুগ্ধতা! আলাপ, পরিচয়, টান অনুভব—যে টান কাছে নিয়ে আসে। কিছু বলার সাহসও জোগায়। বলাও হয়েছে! উত্তর হ্যাঁ কিংবা না—বিয়ের খবরেই তা পরিষ্কার।

ভালোই ছিলেন জো আর অ্যানি। সুখেই ছিলেন। ইচ্ছা ছিল দুজন মিলে একটা পাব (পানশালা) খুলবেন। ব্যাবসাটা নাকি খুবই লাভজনক; কম পরিশ্রমে অধিক লাভ। অন্যান্য ব্যাবসার দোকানির মতো সকাল থেকেই 'পাব' খুলে বসে থাকতে হয় না।

নিজেকে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়। ঘর-সংসারের ব্যস্ততা সেরে বিকেল বা সন্ধার সময় গিয়ে 'পাব' খোলো আর মাঝরাতে বন্ধ করো—কাজ এটুকুই। একবারেই ঝামেলামুক্ত; থাকলেও তা কম। মাঝেমধ্যে কোনো মাতাল বেশি বেপরোয়া হলে তার প্রাপ্য যত্নের দায়িত্বটা কমিউনিটি পুলিশেরই। লক্ষ্য অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করে উভয়ে কিছু টাকাও জমাচ্ছিলেন।

বিয়ের বছর চারেকের মাথায় চক্ষু শীতলকারিণী ম্যাগি'র জন্ম হলে মা-বাবা দুজনেই স্বর্গসুখ অনুভব করলেন। সেই সুখ কেবল তাবৎ দুনিয়ার বাবা-মা-ই অনুভব করেন। জো'র স্ত্রী তার টুকটুকে লাল এই জীবন্ত পুতুলের নাম রাখলেন 'মার্গারেট'। আর জো'র ভাষায়—'মাই লিটল ডল'; আদর করে ডাকতেন 'ম্যাগি'।

এই 'লিটল ডল' ম্যাগির সাথেই সারাদিন মেতে থাকতেন জো। সে-ই যেন তার দুনিয়া, তার সবকিছু। বছর দুয়েকের মাথায় দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হতে চললেন জো।

এবারে বাধল বিপত্তি! অ্যানির শারীরিক অবস্থা আগের মতো স্বাভাবিক নয়! প্রেগন্যান্সির ষষ্ঠ মাস থেকেই তিনি নানাবিধ শারীরিক সমস্যায় ভুগতে লাগলেন; চিকিৎসাও চলছিল যথারীতি।

দুর্ভাগ্য! শেষ রক্ষাটা হলো না। এক রাতে হঠাৎ করে ভীষণ প্রসব বেদনায় স্ত্রী ছটফট করতে লাগলেন, নেওয়া হলো হাসপাতালে। ভোরের আলো ফোটার আগেই জো'র জগৎটাকে সারাজীবনের জন্য আঁধারে ঢেকে দিয়ে একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন অ্যানি। সেইসঙ্গে পাড়ি জমালেন ওপারে! মাতৃহারা ছয় বছরের ম্যাগি'র দেখভালের দায়িত্বটা বাবার কাঁধে আগের তুলনায় আরও ভারী হলো।

স্মৃতির জাম্বিল; পথিকের সম্বল

নিউক্যাসল এয়ারপোর্ট। অবস্থান উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডে। প্রখ্যাত শহর এটি। আমিরাত এয়ারলাইন্সে এসে নামলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে বিমানের পেট থেকে বেরিয়েই ছুটলাম ইমিগ্রেশনের দিকে।

লন্ডনের হিথ্রো কিংবা গ্যাটউইক এয়ারপোর্টের মতো ততটা ব্যস্ত নয়। তারপরও বিশাল বপুওয়ালা বিমানটা দুবাই থেকে একটানা প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা উড়ে এসেছে প্রায় সাড়ে চারশত যাত্রী নিয়ে। ছোট্ট এই এয়াপোর্টে চার শতাধিক যাত্রী একত্রে অবতরণ, তা-ই বা কম কীসে!

ভাগ্যটা ভালোই বলা চলে, মাত্র কয়েক মিনিটেই ইমিগ্রেশনটা শেষ হলো। ব্যাগেজ কনভেয়ার বেল্টেও তেমন একটা দেরি হলো না। খুব সহজেই ব্যাগেজ পেয়ে গেলাম। সোজা গ্রিন চ্যানেল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই অনুভূত হলো–কেউ যেন বরফ মেশানো পানি মুখের ওপরে ঢেলে দিলো!

এ সময়ে এতটা ঠান্ডা আবহাওয়ার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না; যদিও এই আবহাওয়া আমার জানা। ইংল্যান্ডের আবহাওয়া সম্পর্কে এক মজার কথা ছড়িয়ে আছে। বলা হয়ে থাকে–ইংল্যান্ডে তিনটি ডব্লিউকে (3W’s; Wemen, Wine and Weather) কখনো বিশ্বাস করতে নেই!

বেশ কিছুদিন দেশে কাটিয়েছি। ভারতেও গিয়েছিলাম মাঝে কিছুদিনের জন্য। সেখানে আবহাওয়া একধরনের। আর কয়েক ঘণ্টা বিমানে থাকলেও নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় তা সুখকর ও সহনীয় ছিল। মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের যাত্রাবিরতি ছিল দুবাই এয়ারপোর্টে, তাও এয়ারপোর্টের নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায়। যেহেতু শহরের ভেতরে ঢুকিনি, তাই মরু আবহাওয়ার অসহ্য গরমটা সহ্য করতে হয়নি।

তবে মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার ব্যবধানে ইংল্যান্ডের মাটিতে পা দিতেই গরম নয়; বরং চরম কনকনে ঠান্ডার একটা ঝাপটা এসে মুখের ওপর আছড়ে পড়ল যেন! একরকম দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠেই গা এলিয়ে দিলাম।

ঘণ্টা দেড়েকের বিরতিসহ দীর্ঘ প্রায় পনেরো ঘণ্টার বিমান জার্নি করলাম। শারীরিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে বড্ড ক্লান্তিবোধ করছি। স্থানীয় সময়ের ব্যবধান ছয় ঘণ্টা। যার কারণে শরীরটাও ঘুমের সাথে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে। দুই-একদিন এমনটা হবে তা নিশ্চিত।

পকেট থেকে ফোনটা বের করে ইংল্যান্ডের নম্বরটা অ্যাক্টিভেট করতে শুরু করলাম। নিরাপদে পৌঁছার বিষয়টি আম্মাকে জানাতে হবে। তিনি অস্থির হয়ে আছেন; থাকবেনও, যতক্ষণ না তাঁকে জানাচ্ছি।

দীর্ঘ প্রায় তিন যুগ ধরে একই রুটিন। অভ্যস্ত হয়ে গেছি একটা বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে। একসময় এ সবকিছুর মধ্যেও একধরনের আনন্দ ছিল, এখন সেটা আর নেই।

নিশ্চিত জানি, আমার কল পেয়ে আম্মা খুশি হবেন। কথা বলবেন। কথা শেষে ফোনটা রেখে নিজের চোখ দুটো আঁচলে মুছবেন। মা তো মা-ই! বুড়ো হলেও আম্মার কাছে আজও তার কোলের শিশুই রয়ে গেলাম!

বারবার দেশ থেকে আসার সময় এই যে একটা চিত্র–আম্মাকে কাঁদিয়ে আসতে হয়–এটা আমাকে খুব কষ্ট দেয়।

আজকাল আর জার্নিই করতে ইচ্ছা করে না। বিমান জার্নিও না। বিমান জার্নির মধ্যেও আগেকার সেই প্রাণ চাঞ্চল্য কিংবা থ্রিল নেই, যা ছিল আজ থেকে তিন যুগ আগে।

একটা সময় ছিল যখন বিমান জার্নির জন্য মুখিয়ে থাকতাম। জার্নিটাকে উপভোগ্য করার জন্য কত পরিকল্পনা আর আয়োজন থাকত ভেতরে ভেতরে! সেসব এখন অতীত। মনে হলে কেমন যেন লজ্জিত হই। হাসিও পায়। কী ছেলেমানুষিটাই না ছিল একটা সময়!

দিন, বয়স, রুচি সবই তো পালটেছে। আর সেইসঙ্গে মনটাও। এখন আর এই বিমান জার্নিটা আনন্দের মনে হয় না; বিরক্তিকর মনে হয়। মনে ভাবনার উদয় হয়–যদি পায়ে হেঁটে চারপাশের দৃশ্যপট দেখতে দেখতে, কারও সাথে খোশগল্প করতে করতে চলে যেতে পারতাম দেশে!

তা কি সম্ভব? ভাবলেই হলো? সাড়ে সাত হাজার মাইল পথ! এখন কি আর সেই ইবনে বতুতার যুগ রয়েছে, পায়ে হেঁটে কিংবা গাধা-ঘোড়া আর উটের পিঠে চড়েই পঁচাত্তর হাজার মাইল পথ সফর করব? জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ সময়ই কাটিয়ে দেবো পথে পথে!

তারপরও মন উতলা হয় ভ্রমণের জন্য। পথে দুর্ভোগ, কষ্ট, আর ক্লান্তি মনের সেই অস্থির ভাবকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। মন বলে পথে নামতে। আবারও বেরিয়ে পড়তে।

জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি

রিচার্ড রিড। একজন রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। ব্রিটিশ রয়্যাল আর্মির ইনফেন্ট্রি ডিভিশনের অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রিটায়ার করার পরেও দীর্ঘদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। সেখানে তার একটা শূকরের খামার ছিল। কয়েকশত হেক্টর জমি, বাগান আর বাড়িও ছিল। কয়েক বছর আগে সেগুলো বিক্রি করে ব্রিটেনে ফিরেছেন।

ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিকতা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাও বাদ যায়নি। সেখানে নিয়োজিত ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর অফিসাররা চরম অপেশাদার ছিলেন। মানুষের ওপর শক্তি, ক্ষমতা ও প্রভাবের অপব্যবহার করতেন। ফলে সময়ের ব্যবধানে একেকজন জমিদার বনে গিয়েছিলেন।

সহজ-সরল কালো নিগ্রোদের ঠকানোতে তারা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভয়ভীতি দেখিয়ে একরের পর একর জমি তারা নিজেদের মালিকানায় নিয়েছেন। সেই ভূমিতে স্বল্প পারিশ্রমিক কিংবা বিনা পারিশ্রমিকে দখলকৃতদের খাটিয়ে নিয়েছেন যুগের পর যুগ। বিভিন্ন ফসল আবাদ আর কাঠের ব্যবসায় ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন।

সাদা চামড়ার এই সব জমিদাররূপী ইংরেজরা অত্যন্ত কঠোর মেজাজ আর হিংস্র স্বভাবের ছিলেন। বর্ণবাদী চরিত্রেও তারা ঘৃণিত শ্রেণির মানুষ।

এ পর্যন্ত যে কজনের সাথে মিশেছি, তারা আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। তারা প্রায় সকলেই চিন্তা-চেতনায় ফ্যাসিস্ট ধরনের। কথাবার্তায় উগ্র আর অত্যন্ত সংকীর্ণ মানসিকতার। তবে তাদের প্রায় সকলেই অত্যন্ত ধনাঢ্য!

আধুনিক ইংলিশ সমাজে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত। অন্তত কাগজে-কলমে হলেও এখানে বর্ণবাদের স্থান নেই। কেউ যদি বর্ণবাদের অভিযোগ নিয়ে আদালতে যায় এবং তা প্রমাণ করতে পারে, তাহলে যতই প্রভাবশালী আর সাদা চামড়ার হোক না কেন—তার কোনো নিস্তার নেই; জেলের ভাত তাকে খেতেই হবে।

সম্ভবত এ কারণেই কি না দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুদিন হলেও যেসব ইংরেজ সৈনিক বা ব্যবসায়ী থেকেছেন, তারা কেউ-ই আর ইংল্যান্ডে ফিরে আসেনি; স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যও না।

কদাচিৎ যারা এসেছেন, তাদের আচরণ, কথাবার্তা আর ব্যবহার ছিল অস্বভাবিক। দেখেই বোঝা যেত, তারা অত্যন্ত বর্ণবাদী ও ফ্যাসিস্ট চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক। এমন স্বভাবেরই একজন হলেন রিচার্ড। তার সাথে পরিচয় আমার পেশাগত দায়িত্বের সূত্র ধরে। মাত্র সতেরো বছরের তরুণ রিচার্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ আর্মিতে রিক্রুট হন। একসময় যুদ্ধবন্দি হিসেবে বছরখানেক জার্মানিতে ছিলেন।

রিচার্ড আপাদমস্তক বর্ণবাদী। সাদা চামড়ার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, পুরো বিশ্বই তাদের জন্য। বিশ্বকে শাসন করার, তা ভোগ করার অধিকার একমাত্র সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ানদেরই রয়েছে। সবার আগে ইংরেজদের-ই তা পেতে হবে।

কোনো এক কর্মস্থল থেকে তিনি ব্রিটেনে ফেরেন। কিছুদিনের মধ্যেই পরবর্তী পোস্টিং হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। নিম্নপদস্থ একজন সৈনিক হলেও খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে।

সেখানেই তিনি রিটায়ার্ড করেন এবং সেখানেই জমিদারি স্টাইলে বসবাস করতেন। স্বভাবে উগ্র, তাই ঝামেলা পিছু ছাড়ে না। প্রকাশ্য দিবালোকে এক কালো নিগ্রো শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করেন তিনি।

ফার্মে কর্মরত সেই শ্রমিককে দিয়ে নিজ বাংলোর বাগান পরিচর্যা থেকে শুরু করে নানা ফুট-ফরমায়েশ খাটিয়ে নিতেন। অতিরিক্ত শ্রমের বেতন ও পারিশ্রমিক নিয়ে তর্ক হয় দুজনের মধ্যে। কথা আর পালটা কথার মাঝেই কালো চামড়ার মানুষটিকে গুলি করে হত্যা করেন।

সাউথ আফ্রিকার বর্ণবাদী আদালতে মামলা হয়। শ্বেতাঙ্গ বিচারকের সামনে রিচার্ড অতি সহজেই প্রমাণ করতে সফল হন, তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। জীবন বাঁচাতে তার গুলি চালানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

আত্মরক্ষার (!) জন্য গুলি চালিয়েছিলেন কথাটি সত্য। নিজ কর্মীকে জানে মেরে ফেলার কোনো অভিপ্রায় তার ছিল না। অনাকাঙ্ক্ষিত এ দুর্ঘটনার জন্য হত্যাকারী খুবই মর্মাহত এবং ভীষণভাবে অনুতপ্ত!

দুর্ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর থেকে রিচার্ড মানসিক অনুশোচনায় ভুগছেন। অনুতাপে ঠিকমতো ঘুমোতেও পারেন না। মাননীয় আদালত দয়াপরবশ হন। রিচার্ডকে কারাগারে না পাঠিয়ে নিহতের পরিবারকে সামান্য কিছু ক্ষতি পূরণের আদেশ দেন।

উম্মু আলার আত্মসম্মানবোধ

কুয়েতের একমাত্র মেন্টাল হাসপাতালের আট নম্বর ওয়ার্ডের অফিস রুমটায় উম্মু আলা রাগে ফুঁসছেন। তাকে কোনোমতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। তিনি একটু আগেই অফিসে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে এসেছেন। এখনই বেরিয়ে যাবেন অফিস থেকে—এটাই তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

নিয়মানুযায়ী তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিলেও তা কার্যকর হতে এখনও এক মাস সময় লাগবে। তার নিয়োগপত্রের সময় সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে এতটুকু সময় কাজ করতে তিনি বাধ্য। ৩০ দিন পরেই তিনি তার পাওনা অর্থ ও কুয়েত ত্যাগ করার অনুমতিপত্রসহ ফিরতি বিমানের টিকেট পাবেন।

হঠাৎ মৃত্যু, অসুস্থতা বা পঙ্গুত্বের কারণে হয়ে থাকলে সেটা আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে পারলে এক মাসের আগেই মোটামুটি সপ্তাহ খানেকের মধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়।

যে কারণে উম্মু আলা পদ্যতাগ করছেন, তা জরুরি আপদকালীন হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। উম্মু আলা সে কথা শুনতে মোটেও প্রস্তুত নন। তিনি এই 'হারাম' দেশে আর একটা দিনও থাকতে প্রস্তুত নন; আজই চলে যাবেন মিশরে!

অন্যান্য মিশরীয় কলিগরা তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন—আজ কেন, আগামি দুই-একদিনের মধ্যেও তিনি চাইলে যেতে পারবেন না। কারণ, তাকে অফিস থেকে খুরুজিয়া তথা অ্যাক্সিট পারমিট নামক লিখিত অনুমতিপত্র জোগাড় করতে হবে আগে। সেটা ছাড়া এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি কোনো বিদেশিকে বিমানের বোর্ডিং পাস ইস্যু করেন না।

তা ছাড়া বিমানের টিকিট ও ফ্লাইট বুক করতে হবে। টিকিট হাতে পেতে হবে। তাতেও সময় লেগে যাবে কিছুটা। কুয়েত-কায়রো, কুয়েত-আলেকজান্দ্রিয়া বা কুয়েত-লুক্সর অত্যন্ত ব্যস্ত রুট। সারা বছরই এসব রুটে যাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকে। চাইলেই যখন-তখন বিমানের আসন পাওয়া যায় না; দুই-একদিন আগে টিকিট বুক করতে হয়।

আমাদের উম্মু আলার মাথায় যেন এতসব যুক্তির কোনোটাই ঢুকছে না। এতসব আইন-কানুন আর স্থানীয় ও সরকারি রীতিনীতির কোনো কথাই শুনতে রাজি নন তিনি। নিজ দেশের কলিগদের কোনো পরামর্শই তিনি কানে নিচ্ছেন না। তার একই কথা—তিনি আজই চলে যাবেন। এই 'হারাম' দেশে আর একটা দিনও নয়।

তার এই অনড় মনোভাব রাগের চোটে, লাল গোলাপের বর্ণ ধারণ করা মুখ কম্পমান অবস্থায়। আর মাশাআল্লাহ বাজখাঁই গলা, সেইসঙ্গে তাকে ঘিরে ধরা প্রায় গোটা চারেক মিশরীয় নারী-পুরুষ কলিগদের হাসাহাসি দেখছিলাম। কিছুটা দূরে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

আমার কানে বারবার বাজতে লাগল, তার বলা সেই কথাটা—'এই হারাম দেশে আর একটা দিনও নয়!' বাক্যের মধ্যে উচ্চারিত 'হারাম' শব্দটা কর্ণকুহরে আটকে গেছে যেন। আমার সকল মনোযোগ আর কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষ এই শব্দটা।

কোনো কোনো কলিগ রসিকতা করে উম্মু আলাকে একজন 'সাইদি' বলতে লাগলেন। এই উপাধির লোকদের বিষয়ে বলা হয়ে থাকে, তারা মাথামোটা; কোনো যুক্তি শুনতে ও মানতে চায় না। সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন তাদের কলিগকে।

কলিগদের অনুরোধ ও উপদেশ শুনে উম্মু আলা আরও ক্ষেপলেন যেন। তাদের ওপরেও চড়াও হলেন বেশ কয়েবার। চোস্ত মিশরীয় টানে সেই সব কলিগদের ছরছর করে বেশ কিছু কথা শুনিয়ে দিলেন ইচ্ছামতো! ঈমান বিক্রি করে পয়সা কামাতে তারা এখনও এ দেশে থাকতে চায় দেখে খুব করে একচোট বলে গেলেন।

'আত্মসম্মান থাকলে, মনে আল্লাহর ভয় থাকলে, এমন দেশে তারা চাকরি বা ব্যাবসা কোনো অজুহাতেই থাকতেন না।' বার কয়েক সে কথাটাও খুব জোরের সাথেই বলে গেলেন।

ওদের কথোপকথন শুনছি। মূল বিষয়টা কী, তা জানার জন্য আমার মনের আগ্রহ বেড়েই যাচ্ছে। অপেক্ষায় আছি। সুযোগ পেলেই উম্মু আলাকে প্রশ্ন করে জানব। স্বজাতি, স্বধর্মীয় মুসলিম আরব দেশকে তিনি কেন বারবার 'হারাম দেশ', 'হারাম জনপদ' বলে কটাক্ষ করছেন!

এই মুহূর্তে উম্মু আলাকে প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই। তা ছাড়া তার যে মানসিক অবস্থা দেখছি, এ সময় তিনি আমার কোনো প্রশ্নের জবাব দেবেন বলে মনে হয় না।

যে কয়েকজন মিশরীয় কলিগ মিলে এতক্ষণ ধরে উম্মু আলাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে আমার কাছের বন্ধু হিশাম আল কাফরাওয়িও রয়েছেন। মূল কারণটা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। উম্মু আলা না হোক, হিশামের কাছ থেকে ব্যাপারটা জানা যাবে। অতএব, অপেক্ষায় থাকলাম।

'উম্মে আলার' আসল নাম ফাতহিয়া আবদুল মুনিম। তিরিশোর্ধ্ব, স্থূলকায় ও লাল গাত্রবর্ণের এক মিশরীয় নারী। উচ্চতা ছয় ফুট না হলেও তার কাছাকাছি হবেন। তিন সন্তানের মা। বছর চারেক ধরে কুয়েতের পাবলিক হেলথ মন্ত্রণালয়ে তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন।

স্কুলশিক্ষক স্বামী এবং ওই তিনটি সন্তানসহ ছোট্ট মরুরাষ্ট্র কুয়েতের দক্ষিণাঞ্চলীয় জনপদ খাইতানে বসবাস করেন।

জীবনের গল্প, শুনে যাও অল্প

আত্তারের ঠোঁটজোড়া থরথর করে কাঁপছে। সাথে সিগারেট ধরা হাতটাও। তার দুটো চোখ বেয়ে সেই যে অশ্রুর ধারা বয়ে চলেছে; থামার কোনো লক্ষণই নেই যেন। আজ কি তাহলে আষাঢ় নেমেছে? আকাশটাই কি ভেঙে পড়ল? তবে কোন কারণে?

আমার নিজের চোখজোড়াও কেমন জ্বালা করে উঠতে চায়। বড়ো কষ্ট করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখি। আত্তারকে সামলে নিতে টিভিরুমে নিতে চাই। তার হাতটা ধরে ওদিকটায় নেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু আত্তার এক পা'ও নড়েন না।

তিনি বরং তার হাতটাকে আমার হাতের ভেতর থেকে আলতো করে ছাড়িয়ে নেন। তারপর একটু চুপ থেকে, চোখের ওপরে চোখ রেখে, খুব নরম স্বরে বলে ওঠেন–'যদি কোনো একদিন দেখা পেতাম, একটা মাত্র দিন, শুধু একটাবারের মতো! জানো জিয়া, আমি আমার মায়ের কাছে শুধু একটা কথাই জানতে চাইতাম–ওই হারামজাদাটাকে কেন তিনি খুন করলেন না?'

আত্তারের কথাগুলো শুনলাম। কিছুই বললাম না। কারণ, আমি জানি–তিনি কার কথা বলছেন। কাকে তিনি খুন করতে চান। কেনই-বা তার এত ক্ষোভ জন্মদাতা বাবার ওপর–তা-ও আমার জানা। তাতে আমার করার কিছু নেই, সম্ভবত কারোরই কিছু করার নেই।

একটা সময় ছিল যখন পারলে বা 'ইচ্ছা করলে' অনেকেরই কিছু একটা করার সুযোগ ছিল। সর্বোপরি তা দায়িত্বও। মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।

আত্তারের দুর্ভাগ্য, এমন একটা সময়, পরিবেশ ও সমাজে তার জন্ম–কেউ-ই ওই কাজটুকু করেনি; করার গরজটা কেউ উপলব্ধি করেনি।

আবার আমার মতো দুই-চারজন কেউ যদি সেই গরজ উপলব্ধি করেও থাকে, তাহলেও করার কোনো পথ ও সুযোগ ছিল না। যেমন–আজ আমার নিজেরই কিছু করার নেই; যদিও সুযোগ থাকলে আমি তার জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করতাম।

আত্তার টিভিরুমে যাওয়ার কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। তিনি ফুটবল খেলার দারুণ ভক্ত। তাকে টেনে নিয়ে টিভি সেটের সামনে বসিয়ে দিতে চাইলাম। ওই খেলা সম্প্রচারিত হচ্ছে এমন কোনো চ্যানেল চালু করে বসিয়ে দিতে পারলে একটু শান্ত হতেন বোধ হয়।

এই মুহূর্তে হয়তো সরানো যাবে না। তিনি এখন স্মৃতিচারণে ব্যস্ত। মায়ের না দেখা মুখ কিংবা বলা চলে, কোনো এককালের তেল চিটচিটে অতি পুরোনো এক ছবিতে দেখা তরুণীর হাস্যোজ্জ্বল মুখটা স্মরণ করে নিজের সাথে বিড়বিড় করেন, কিছুক্ষণ কথা বলেন।

সারাটা বারান্দাজুড়ে একা একা পায়চারি করেন। হাতে ধরা থাকে কড়া মার্লবোরো ব্র্যান্ডের সিগারেট। কখনো তিনি উত্তেজিত হয়ে দেয়ালের দিকে দুই-একটা ঘুসি ছুড়ে দেন, আবার কখনো নিজেই নিজের সাথে মাথা নাড়িয়ে কথা বলেন, হাসেন, কাঁদেন।

এভাবে কয়েক ঘণ্টা চলে যায়। এরপর একটা সময় ক্লান্ত আত্তার বিছানায় গিয়ে দুই হাঁটুকে বুকের কাছে টেনে নেন। ছোট্ট কম্বলটা মুড়ি দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে শুয়ে পড়েন। সারা বিশ্ব থেকে যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একটু একা থাকার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা!

আত্তার মূলত একা। এই যে এত ব্যস্ততায় ভরা বিরাট কর্মচঞ্চল জগতে তার পাশে কেউ নেই। চারিদিকে কেবলই শূন্যতা আর শূন্যতা। তিনি যে এখনও কীভাবে বেঁচে আছেন–মাঝেমধ্যে আমি সেটাই ভাবি।

শুধু বেঁচেই আছেন তা নয়; বরং অনেকের চেয়ে ভালোমতোই বেঁচে আছেন। তবে তার কারণও আছে। মনে ক্ষীণ একটা আশা এখনও স্থির রয়ে গেছে। সেটাই আত্তারকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং টিকে থাকার মনোবল জুগিয়েছে বলেই মনে হয়।

পুরো নাম আত্তার মাহমুদ। বয়স ৪০ ছুঁইছুঁই করছে। ছোটোখাটো এক আরব 'বেদুইন'। 'বেদুইন' মানে হলো–রাষ্ট্রবিহীন নাগরিক। কুয়েতেই তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। একজন কুয়েতি নাগরিকের ঔরসেই তার জন্ম। তারপরও তিনি কুয়েতি নন; স্টেটলেস বেদুইন!

বেদুইন বলেই কুয়েতের মতো ধনাঢ্য দেশে জন্ম নিয়েও পড়াশোনার যথাযথ সুযোগ পাননি; অথচ তার এসবের অধিকার ছিল জন্মসূত্রেই। তিনি তার এই মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছেন। জীবনে অনেক কিছুই তার পাওয়া হয়নি। বাবা-মায়ের সান্নিধ্য আর পারিবারিক পরিবেশটাই তো অধরা রয়ে গেল। মাকে তো জীবনে চোখেই দেখেননি!

কে তার মা–তা তিনি জানেনও না। কেবল ঘটনাচক্রে যৌবনের প্রারম্ভে এক নিকটাত্মীয়ার কাছে তার মায়ের একটা ছবি পেয়েছিলেন; শুনেছিলেন তার সামান্য কিছু পরিচয়। সেই সুবাদে ছবিতে একনজর মা-কে দেখেছেন।

পুরোনো সেই ছবিটাই আত্তারের একমাত্র সম্বল; সম্ভবত এই পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে প্রিয়–যা আত্তার পরম যত্নে সব সময়ই নিজের কাছে যক্ষের ধনের মতো করে সংরক্ষণ করে থাকেন। দিন-রাত চব্বিশটা ঘণ্টা ছবিটা তার সঙ্গে। তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত, একটা মুহূর্তও তিনি ছবিটাকে হাতছাড়া করবেন না, করেনও না।